রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্মৃতির ছবি

অভীককুমার দে

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৭০০ ০১০

ভূমিকা

ছবি তোলা আমার নেশা, কার্যগতিকে পেশাও বটে। আর রবীন্দ্রনাথ আমার ভালোবাসা। জন্মসূত্রে বাঙালি হওয়ায় রবীন্দ্রনাথকে পেয়েছি উত্তরাধিকারসূত্রে। আর সেই দাবিতেই অনায়াসে চলে নিত্য নতুন খেলা তাঁকে নিয়ে। বন্ধুর পথ অনায়াসে পার হয়ে যাই তাঁর হাত ধরে। তাঁর সঙ্গ পাওয়ার জন্য কোনো মন্ত্র বা সাধনার প্রয়োজন হয়নি, অথচ তিনি 'কত বেশে নিমেষে নিমেষে নিতুই নব'। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ধরা দেন, ধরা দেন তাঁর ছবিতে। সেই ছোটবেলা থেকে কত ছবি দেখলাম রবীন্দ্রনাথের। ছবি তোলার আর দেখার নেশা যেমন আমাকে পেয়ে বসেছে, রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখার প্রতি টানও তেমনি বেড়েছে। তারপর ১৯৮৬ সালে যখন ছবির মালা গেঁথে রবীন্দ্রজীবন দেখার একটা ডাক এল শ্রীমতী প্রণতি মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে তখন থেকে শুরু হলো নতুন করে তাঁকে দেখা। নতুন করে তাঁকে আবিষ্কার করার নেশা পেয়ে বসল আমাকে। জীবনের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে চলা নয়, রবীন্দ্রনাথের নানা বয়সের নানা মুডের ছবির ভিতর দিয়ে তাঁর জীবনকে দেখার চেষ্টা করেছি এই বইয়ে। সিদ্ধার্থ ঘোষ তাঁর ছবি তোলা বাঙালির ফটোগ্রাফি-চর্চা গ্রন্থে বলেছেন রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য ফোটোগ্রাফ আছে। তাঁর জীবনের মধ্য ও অন্ত্য পর্বের বিখ্যাত কয়েকজন আলোকচিত্রীর কথাও সুবিদিত। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর কথা চিন্তা করলে, যতই আমরা পিছোতে থাকব, দুর্লভ হয়ে উঠবে রবীন্দ্রনাথের আলোকচিত্র। ততই দুর্জ্ঞেয় হবে তাদের স্রষ্টার পরিচয়।

এ-কথাটাও খেয়াল রাখা দরকার যে অনেক বিষয়ের মতো ফোটোগ্রাফারদের আকর্ষণ করার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ ব্যতিক্রম। চলচ্চিত্র জগতের কথা বাদ দিলে উদয়শংকর ছাড়া আজ অবধি আর কোনো বাঙালির বিভিন্ন বয়সের ও মেজাজের এমন বৈচিত্র্যপূর্ণ ফোটোগ্রাফিক সম্ভার আর রচিত হয়নি।

বহুধাবিস্তৃত ঘটনাবহুল জীবন রবীন্দ্রনাথের। বহুকৌণিক তাঁর পরিচয়। ছবির নির্দিষ্ট ফ্রেমে তাঁকে ধরা প্রায় অসম্ভব বললেই চলে। তার উপরে যে ধরছে তার নানাদিকের সীমাবদ্ধতা তো আছেই। রবীন্দ্রনাথই আমায় সাহস দিয়েছেন। আমিও এই মহাজীবনের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁরই দেখানো পথে চলেছি। মনে রেখেছি জীবনস্মৃতি-র প্রথম পাণ্ডুলিপিতে কবির মন্তব্য, 'কাব্যরচনা ও জীবনরচনা ও-দুটা একই বৃহৎ-রচনার অঙ্গ। জীবনটা যে কাব্যেই আপনার ফুল ফুটাইয়াছে আর কিছুতে নয়, তাহার তত্ত্ব সমগ্র জীবনের অন্তর্গত।' কবিকে দেখব কবির কথা দিয়ে, তাঁকে চিনব তাঁর নিজেকে দেখার ভিতর দিয়ে, এই ইচ্ছা মনে নিয়ে এগিয়েছি। আমি যদি চিত্রকর হতাম, তাহলে নিজের মতো করে আমার রবীন্দ্রনাথের ছবি চিত্রিত করতাম। কিন্তু এখানে সে তো হওয়ার নয়, আমাকে নির্ভর করতে হয়েছে রবীন্দ্রচিত্র, রবীন্দ্রপরিজন-পরিকরদের চিত্র, রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি, গ্রন্থ-সংবাদপত্র এবং রবীন্দ্রজীবন বিষয়ক গ্রন্থ-পত্রিকা ইত্যাদিতে প্রকাশিত তথ্যের উপর। এছাড়াও আছে রবীন্দ্রনাথ থেকেছেন বা যেতেন যে সব বাড়িতে ও প্রতিষ্ঠানে সেই সব বাড়ির ছবি। কয়েকটি বাড়ির অস্তিত্ব এখনো আছে, কিছু নেই, কিছু বা বদলে গেছে।

চিত্রজীবনীর ক্ষেত্রে জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা বা উল্লেখ সম্ভব নয়। এই খণ্ডের কালসীমা ১৮৬১-১৯০০, চল্লিশ বছর। এ পর্বের উপকরণ হলো রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক পরিচয়, তাঁর বাল্য ও কৈশোরকাল, তাঁর কবিতারচনারম্ভ, পরিচিত জগতের মানুষজন। তাঁর যুগের সেই সব ব্যক্তিত্ব যাঁরা তাঁর জীবনে ও মনে বিশেষ রেখাপাত করেছিলেন। আত্মপ্রকাশের বিচিত্র ধারায় নিমগ্ন যুবক রবীন্দ্রনাথ, সংসারী রবীন্দ্রনাথ, বন্ধু-বৎসল রবীন্দ্রনাথ, জমিদার-দেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ।

আগেই বলেছি, সর্বাঙ্গীণ পরিচয়ের অনুপুঙ্খের মধ্যে আমি প্রবেশ করিনি। রবীন্দ্রনাথের প্রথম চল্লিশ বছরকালব্যাপ্ত জীবনের কিছু ছবি মিলিয়ে একটা ছবি ফোটাবার চেষ্টা করেছি, যে ছবির ভিতর দিয়ে তাঁর এই কালের মনটিকে ছোঁওয়া যায়। আর সেখানে কথকের আসনে তাঁকেই বসিয়েছি। এর গোড়ার অংশে মুখ্যত আমায় পথ দেখিয়েছে জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলা। সেই সময় তিনি যেমন করে তাঁর নিজের কাব্য ও অন্যান্য রচনার পরিচয় দিয়েছেন আমরা চেষ্টা করেছি তার কিছু চাক্ষুষ নিদর্শন দিতে। জীবনস্মৃতি থামল এসে কড়ি ও কোমলে। মানসী পর্বে জড়িয়ে আছে তাঁর গাজীপুর বাস। মানসীর কবিতাগুলির জন্ম দিয়েছিল গাজীপুরের শান্ত অবকাশ। এরপরই পিতার আদেশে জমিদারি দেখাশোনার কাজে প্রস্তুত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। এবার শুরু হলো ছিন্নপত্র-এর কাল। এই সূত্রেই পূর্ববঙ্গের সঙ্গে তাঁর পরবর্তী দশ বছরের নিবিড় যোগাযোগ রচিত হয়েছে, যার অজস্র ফসল তুলেছে তাঁর সৃজনশীল মন কবিতায় গানে ছোটগল্পে ব্যক্তিগত চিঠিতে। পূর্ববঙ্গের অসামান্য প্রাকৃতিক পরিবেশ যেমন প্রাপ্তির দিকে তাঁকে ভরে তুলেছে তেমনি সৃষ্টির অজস্রতায় তিনি নিজেকে ঢেলে ধরেছেন। সমসাময়িক রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক আন্দোলন বা কাজকর্ম থেকেও নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন নি।

এই কাজ শুরুর কিছুদিনের মধ্যেই কাজটির গুরুত্ব যে কতখানি সে কথাটা শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের 'রবীন্দ্রচর্চার ভবিষ্যৎ' ভাষণ শুনে অনুভব করতে পেরেছিলাম। রবীন্দ্রনাথবিষয়ক অনেক সম্ভাব্য কাজের প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন এই সেদিন Russell সম্বন্ধে একখানি অতি সুন্দর মনোহর বই হাতে এল— The Life of Bertrand Russell in Pictures and in His own Words। প্রায় একশ পাতার এই বইখানিতে রাসেলের ছবি আর রাসেলের নিজের কথায় এই দার্শনিকের জীবনকথা উজ্জ্বল এবং সরস হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এরকম একখানি বই আরও চিত্তাকর্ষক হবে। কিন্তু এমন শ্রমসাধ্য নতুন কাজে হাত না দিয়ে আমরা অমল হোম সম্পাদিত Calcutta Municipal Gazette-এর রবীন্দ্রসংখ্যাটি আবার ছেপে কৃতার্থ বোধ করলাম। Calcutta Municipal Gazette-এর এই সংখ্যাটি এক অমূল্য বস্তু। এবং অমল হোমের এক অক্ষয় কীর্তি। এটির পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন ছিল। তবে এই বইয়ের ছবিগুলি ব্যবহার করে আমরা রবীন্দ্রজীবনী চিত্র এবং কবির নিজের কথায় বলে একখানি গ্রন্থ প্রস্তুত করে বাঙালি পাঠকের হাতে দিতে পারতাম। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ একাজ করতে পারতেন।

শ্রীদাশগুপ্তের সঙ্গে দেখা করে Russell-এর বই দেখলাম। পরম আগ্রহ ভরে আরও অনেক বইয়ের উল্লেখ করলেন, দেখালেন। পুনরপি বললেন, একাজ বাঙালির দায়িত্ব, তিনি আমাদের জাতীয় চেতনা, সম্পদ, গর্ব, অভিমান। তাঁর কাছে আমাদের ঋণশোধ করতে এ কাজটা হওয়াও খুব জরুরি। শেষে আবদার করেছিলেন, দেখে যেতে পারব তো বাবা।

কাজ করতে গিয়ে দেখলাম আমাদের দেশে গ্রন্থাগার-আর্কাইভসের দায়িত্বে যাঁরা আছেন, তাঁরা সেখানকার সম্পদ মানুষের থেকে নিরাপদ দূরত্বে সিন্দুকজাত করে রাখতেই পছন্দ করেন। আমার স্বল্প সামর্থ্যে বিদেশে যোগাযোগ করে দেখেছি, শুধুমাত্র চিঠিতে প্রয়োজন জানাতেই তাঁদের সাড়া পাওয়া গেছে। তাঁদের সহযোগিতার হাত সবসময় বাড়ানো। অথচ স্বদেশে প্রায় সর্বত্র বিপরীতচিত্র। কোনো প্রয়োজনীয় উপকরণ অনেক সাধনায় যদি বা দেখতে পাওয়া গেল, কিন্তু ছবি তোলা যাবে না। অথচ আমার তো শুধু পড়া বা দেখা নয়, তার ছবিও চাই। রবীন্দ্রনাথের প্রথম সংস্করণের বই পাওয়া দুষ্কর। হয়তো জানা গেল কোনো এক জায়গায় আছে, সেখানে গিয়ে শোনা গেল, 'ও সব বই তো বার করা যাবে না।' যদি বা বার করা গেল কিন্তু তার ছবি তোলা যাবে না, যদি বা ছবি তোলা যায় তা আখ্যাপত্র ছাড়া তুলতে হবে। নানা বাহানায় শুধু না না না।

এক সময়ে বিশ্বভারতী প্রস্তাব দিয়েছিল, বইটি সেখান থেকে ছাপা হবে। মন ভরেছিল প্রত্যাশিত অনেক ছবি দিয়ে কাজটা করতে পারব ভেবে। সে চেষ্টা একেবারেই ব্যর্থ হয়ে যায়, যখন কর্তৃপক্ষ কোনো সাহায্য করবেন না বলে দরজা বন্ধ করে দিলেন, We will not allow you to use any material of and on Tagore এই সিদ্ধান্তে। খুব হতাশ হয়েছিলাম, অনেকদিন কাজটা থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলাম। আমার বেদনার কথা জেনে শ্রীঅরুণকুমার বসু বলেছিলেন, 'মোর ভাগ্যতরী এটুকু বাধায় গেল ঠেকি?' শ্রীশঙ্খ ঘোষ বলেছিলেন, 'সকলের হয়ে কাজটা করছ, আগে শেষ করো।'

আমার সীমাবদ্ধতা কতটা সে আমি জানি, কিন্তু সেদিন এঁদের কথায় আমি মনে জোর পেয়েছিলাম, অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। উপকরণের অভাবে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে যখন নিশ্চল হয়ে আছি, আমার মুখে আমার সমস্যার কথা শুনে রবীন্দ্রভারতী প্রদর্শনশালার অধ্যক্ষা শ্রীমতী ইন্দ্রাণী ঘোষ নিজে সমস্ত অনুমতির ব্যবস্থা করে দরজা খুলে দিলেন। তাঁর সহায়তা শুধু যে কাজের রসদ দিয়েছে তা নয়, তাঁর আগ্রহ ও আন্তরিকতায় কাজ করার প্রেরণা পেয়েছি। ভবিষ্যতেও এইভাবে সকলকে কাজ করতে সুযোগ দেওয়ার মনটি তাঁর চিরজাগরূক থাকুক— এই কামনা করি। রবীন্দ্রভারতী প্রদর্শনশালার শ্রীমতী তুলসীমঞ্জরি গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীচন্দ্রভাল মুখোপাধ্যায়কে তাঁদের সাহায্যের কথা স্মরণ করে কৃতজ্ঞতা জানাই। সর্বোপরি শ্রীমতী ভারতী মুখোপাধ্যায়, মাননীয় উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, যিনি আমাকে তাঁদের সংগ্রহটি ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে বাধিত করেছেন, তাঁর প্রতি রইল আমার অসীম কৃতজ্ঞতা। আমি যেমন যেমন কাজ করেছি প্রয়াত দিলীপকুমার বিশ্বাস, প্রয়াত নির্মলকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশঙ্খ ঘোষ, শ্রীঅরুণকুমার বসু, শ্রীসোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল, শ্রীসুবিমল লাহিড়ী ও শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখিয়েছি। আমার ভাবতে ভালো লাগছে, আমার মতো সাধারণ মানুষের এই খেয়ালখাতা এঁরা কেউ লঘুভাবে নেননি। প্রত্যেকেই যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে দেখেছেন, তাঁদের মতামত জানিয়েছেন। এমনকি তাঁদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে বা কখনও অন্যের সংগ্রহ থেকেও তাঁরা আমাকে প্রয়োজনীয় উপকরণ জোগাড় করে দিয়েছেন। এ-কাজ করতে গিয়ে এই সব মানুষগুলির যে অসামান্য পরিচয় পেয়েছি, সে কোনোদিন ভুলব না। শ্রদ্ধেয় দিলীপকুমার বিশ্বাস অসুস্থতা সত্ত্বেও আমার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদককে চিঠি লিখে দিয়েছিলেন। সেই চিঠির জোরেই সমাজ থেকে হ্যামারগ্রেনের ছবিটি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। কী বলব এঁদের, সকলকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

এই কাজ সংক্রান্ত ছবির মূল ভাণ্ডার আমার কাছে রুদ্ধ ছিল। আমি আমার চারপাশ থেকে যা কিছু পেয়েছি সংগ্রহ করে এনেছি। কোনোটা বদান্য হাতের দান, কোনোটা বা কুড়িয়ে পাওয়া ধন। কখনও বা আধছেঁড়া বই বা পত্রিকার ছিন্ন অংশে দুর্লভ প্রাপ্তি। এ

কারণে কিছু ছবির উৎস আমার অজানা। ইচ্ছা ছিল রবীন্দ্র-অনুষঙ্গে যখন যে সব ব্যক্তির প্রসঙ্গ আসছে তাঁদেরও সমসময়ের ছবি ব্যবহার করার। কিন্তু অনেক সময় তা সম্ভব হয়নি, যেমন ইরাবতী দেবী বা জ্যোতিঃপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি। তাঁদের পারিবারিক সংগ্রহ থেকে আমি এই একটি-একটি ছবিই উদ্ধার করে আনতে পেরেছি।

আমাকে দিয়ে কাজটি সম্ভবপর করিয়েছেন শ্রীমতী প্রণতি মুখোপাধ্যায়। কাজটি শুরু করিয়েছিলেন তিনিই। তিনি এ-কাজের অলিখিত সংকলক ও সম্পাদক। যাবতীয় সমস্যাকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছেন, যোগাযোগ করে দিয়েছেন প্রকাশক সংস্থা পুনশ্চ-র কর্ণধার শ্রীসন্দীপ নায়কের সঙ্গে। তাঁর স্নেহ আশীর্বাদ চিরদিন আমার পাথেয় হয়ে থাকুক— তাঁকে আমার প্রণাম।

ডা. দেবাশিস বসু একজন ব্যস্ত চিকিৎসক। তাঁর অন্য একটি পরিচয় কলকাতা-বিশেষজ্ঞ অভিধায়। দেবাশিস আগ্রহ ভরে এ গ্রন্থের পরিপূর্ণতার চেষ্টায় লিখে দিয়েছেন ঠাকুরবাড়ির বংশপরিচয় ও কুলপঞ্জি। আমি কৃতজ্ঞ তবু তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব-সম্পর্কের দাবিতে কৃতজ্ঞতাপ্রকাশে বিরত রইলাম। এছাড়া যাঁরা মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন বা উপকরণ সংগ্রহে কোনো না-কোনোভাবে সহায়তা করেছেন তাঁরা হলেন শ্রীইন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীঅনাথনাথ দাস, শ্রীইন্দ্রজিৎ চৌধুরী, শ্রীগৌতম ভদ্র, শ্রীতাপস মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅভীক রায়, শ্রীনিমাইচন্দ্র পাল, শ্রীমতী কেয়া দাশগুপ্ত, শ্রীমতী শ্যামলী মিত্র, শ্রীমতী মহুয়া মজুমদার, শ্রীসুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজীবন লাভার, শ্রীবিভাস ধর, শ্রীঅরুণরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজয়প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমোহনদাস প্যাটেল, প্রয়াত দেবীদাস বিশ্বাস। এঁদের সবার কাছেই আমার ঋণ রইল।

আমার কর্মস্থলে সহকর্মীদের সহযোগিতার কথাও ভুলতে পারি না। শ্রীঅচিন্ত্যরঞ্জন দাস, শ্রীঅরুণকুমার সিং, শ্রীমতী শকুন্তলা দে, শ্রীমতী মৃন্ময়ী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমনোজকুমার দত্ত, শ্রীশ্রীদাম কুণ্ডু ও শ্রীগৌতম বসুর অমূল্য সহায়তা আমার কাজকে সহজ করেছে। এঁদের সঙ্গে আমার দীর্ঘকালের সম্পর্ক। আমি জানি এঁরা আমার ধন্যবাদের প্রত্যাশী নন। আমি প্রমথ চৌধুরীর বিখ্যাত উক্তি স্মরণ করে বলি, আমি ধন্য, সেটুকুর উল্লেখ বাদ দিতে চাই না।

১৯৮৬ সালে রবীন্দ্রনাথের চিত্রজীবনীর ভাবনাটা যখন আমার মনের মধ্যে বাসা বেঁধেছে, প্রায় সেই একই সময় সর্বাণীর আগমন ঘটেছিল জীবনসঙ্গিনী হয়ে। সংসারের সব দায়িত্ব নিয়ে কাজের জগতে আমাকে অবাধ বিচরণের সুযোগ দিয়েছে সে প্রথম থেকেই। এ-কাজের সম্পূর্ণতার মধ্যে দিয়েই সে আমাকে পেতে চেয়েছে। এখনও এটুকুই তার দাবি। এই সময়ের মধ্যে কন্যা স্বয়মাগতা আমাকে অবাক করে বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক স্তরের গণ্ডি পেরিয়ে গেল। এ-কথা স্বীকার করি যে আমার যতটা স্নেহসঙ্গ তার প্রাপ্য তা থেকে সে বঞ্চিত হয়েছে। আমি হয়তো আমার খেয়াল নিয়ে মেতে থেকে তার জন্য যথেষ্ট সময় দিই নি, মাঝে মাঝে ছোটোখাটো বিদ্রোহ করলেও আমার কাজের বাধা হয়নি সে। তার প্রতি আমার ভালোবাসা এই কাজের আকর্ষণের সঙ্গে মিশে আছে।

প্রকাশনাজগতে সুপরিচিত পুনশ্চ-এর শ্রীসন্দীপ নায়ক এই গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে যে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন তা আমাকে বিস্মিত করেছে। প্রায় দু-বছর ধরে পরিকল্পিত গ্রন্থের এই খণ্ডটি সাজানোর সময় অনেকবার নানা রদ-বদল করে তাঁকে যথেষ্ট বিব্রত করেছি, কিন্তু তিনি প্রসন্নচিত্তে আমাকে সব রকমের স্বাধীনতা দিয়েছেন। সন্দীপের অনুপস্থিতিতে তাঁর ভাই শ্রীসপ্তর্ষি নায়ক আমার আবদার মেটাতে ত্রুটি করেন নি। আন্তরিকতা গুণে ও ব্যবহারমাধুর্যে এই দুই ভাই আমার ভালোবাসার জগতে একটি বিশেষ স্থান করে নিয়েছেন। শ্রীসুবীর চৌধুরী গ্রন্থের প্রাক্‌প্রকাশ-প্রস্তুতিপর্বের একজন পরিচিত বিশেষজ্ঞ, অসম্ভব ধৈর্য ও আন্তরিক ভালোবাসা দিয়ে তিনি এ-গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠাকে সযত্নে মুদ্রণের জন্য প্রস্তুত করে তুলেছেন। তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানাই। পুনশ্চ-এর শ্রীরোমিও দে, শ্রীঅমিত সাহা, শ্রীনবকুমার চক্রবর্তী, শ্রীপ্রণয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাসিমাখা পরিশ্রমী মুখগুলি মনে পড়ছে। এঁদের সকলকে জানাই আমার কৃতজ্ঞতা। স্মৃতির ছবি প্রথম খণ্ড যে-রূপ নিল, আগ্রহী পাঠক-দর্শকের দরবারে সেটি উপস্থাপনের প্রাক্কালে তাঁদের অভিমত জানার জন্য ঔৎসুক্য অনুভব করছি। সেজন্য প্রতীক্ষায় থাকব। পদে পদে প্রতিবন্ধকতার নৈরাশ্য, বিশ্বাসভঙ্গের ক্ষোভ, পথ-না-পাওয়ার বেদনা এই মুহূর্তে সব অলীক হয়ে গেছে। মন বলছে যে প্রত্যাশা এবং দাবি এই কাজে গতিসঞ্চার করেছে তারই মধ্যে এই চেষ্টার সত্যমূল্য আছে। সুতরাং 'আমাদের যাত্রা হল শুরু'। এখনও অনেক পথ বাকি। অন্তত এটুকু বলতে পারি 'এখন বাতাস ছুটুক তুফান উঠুক, ফিরব না গো আর'।

কলকাতা
২৮ পৌষ, ১৪১২

অভীককুমার দে

স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যেই আঁকুক সে ছবিই আঁকে। অর্থাৎ, যাহা-কিছু ঘটিতেছে তাহার অবিকল নকল রাখিবার জন্য সে তুলি হাতে বসিয়া নাই। সে আপনার অভিরুচি অনুসারে কত কী বাদ দেয় কত কী রাখে। কত বড়োকে ছোটো করে, ছোটোকে বড়ো করিয়া তোলে। সে আগের জিনিসকে পাছে ও পাছের জিনিসকে আগে সাজাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। বস্তুত তাহার কাজই ছবি আঁকা, ইতিহাস লেখা নয়।

এই লেখাটি জীবনী নহে। ... ইহাকে জীবনের পুরাবৃত্ত বলা চলে না— ইহা স্মৃতির ছবি।

পিতামহ। দ্বারকানাথ ঠাকুর

পিতা। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মেজকাকা। গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছোটকাকা। নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে স্বদেশের জন্য বেদনার মধ্যে আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। আমাদের পরিবারে বিদেশী প্রথার কতকগুলি বাহ্য অনুকরণ অনেকদিন হইতে প্রবেশ করিয়াছিল— তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগ সাগ্নিকের পবিত্র অগ্নির মতো বহুকাল হইতে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। আমাদের পিতৃদেব যখন স্বদেশের প্রচলিত পূজাবিধি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তখনো তিনি স্বদেশী শাস্ত্রকে ত্যাগ করেন নাই ও স্বদেশী সমাজকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিয়া ছিলেন। আমার পিতামহ এবং ছোটোকাকা মহাশয় বিলাতের সমাজে বর্ষযাপন করিয়া ইংরাজের বেশ পরিয়া আসেন নাই, এই দৃষ্টান্ত আমাদের পরিবারের মধ্যে সজীব হইয়া আছে।

বড়দাদা। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মেজদাদা। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ন'দাদা। নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেজদাদা। হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওদাদা। ওগেন্দ্রনাথ ঠাকুর

জ্যোতিদাদা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

বড়দাদা বাল্যকাল হইতে আন্তরিক অনুরাগের সহিত মাতৃভাষাকে জ্ঞান ও ভাবসম্পদে ঐশ্বর্যবান করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। মেজদাদা বিলাতে গিয়া সিভিলিয়ান হইয়া আসিয়াছেন কিন্তু তাঁহার ভাবপ্রকাশের ভাষা বাংলাই রহিয়া গেছে। সেজদাদার অকালে মৃত্যু হইয়াছিল কিন্তু তিনিও নিজের চেষ্টায় ও মেডিকাল কলেজে অধ্যয়ন করিয়া বিজ্ঞানের যে-পরিমাণ চর্চা করিয়াছিলেন তাহা বাংলাভাষায় প্রকাশ করিবার জন্য বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। জ্যোতিদাদাও তরুণবয়স হইতে অবিশ্রাম বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধন করিয়া আসিতেছেন। ...এবং পিতামহের আমল হইতে আজ পর্যন্ত সরকারের নিকট হইতে খেতাব-লোলুপতার উপসর্গ আমাদের পরিবারে দেখা দেয় নাই।

শকাব্দ ১৭৮৩/০/২৪/৫৩/০/০
সন ১২৬৮/২৫শে বৈশাখ—জন্মসময় — সোমবার। রাত্রি ২/৩৭ গতে।।

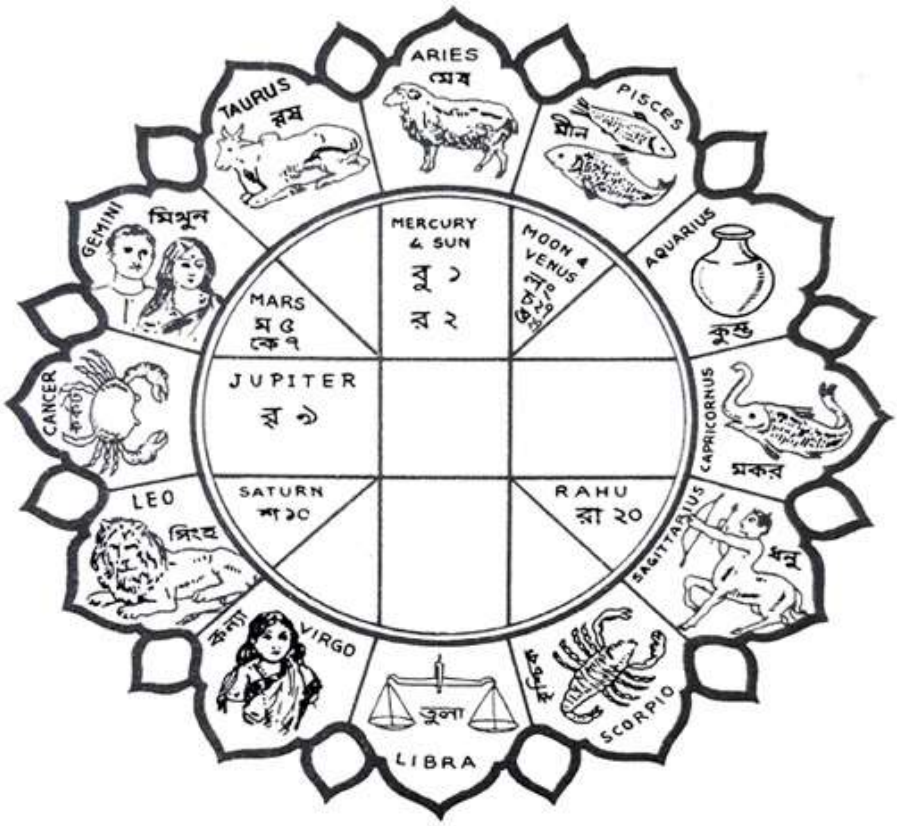

যে-বছরের ২৫শে বৈশাখে আমার জন্ম সে-বছরে ইংরেজি পাঁজি মেলাতে গেলে চোখে ঠেকবে ৬ই মে। কিন্তু ইংরেজের অদ্ভুত রীতি-অনুসারে রাত দুপুরের পরে ওদের তারিখ বদল হয়, অতএব সেই গণনায় আমার জন্ম ৭ই। — তর্কের শেষ এখানেই নয়, গ্রহনক্ষত্রের চক্রান্তে বাংলা পাঁজির দিন ইংরেজি পাঁজির সঙ্গে তাল রেখে চলবে না— ওরা প্রাগ্রসর জাত, পঁচিশে বৈশাখকে ডিঙিয়ে যাচ্ছে— কয়েক বছর ধরে হল ৭ই, তারপরে দাঁড়িয়েছে ৮ই।

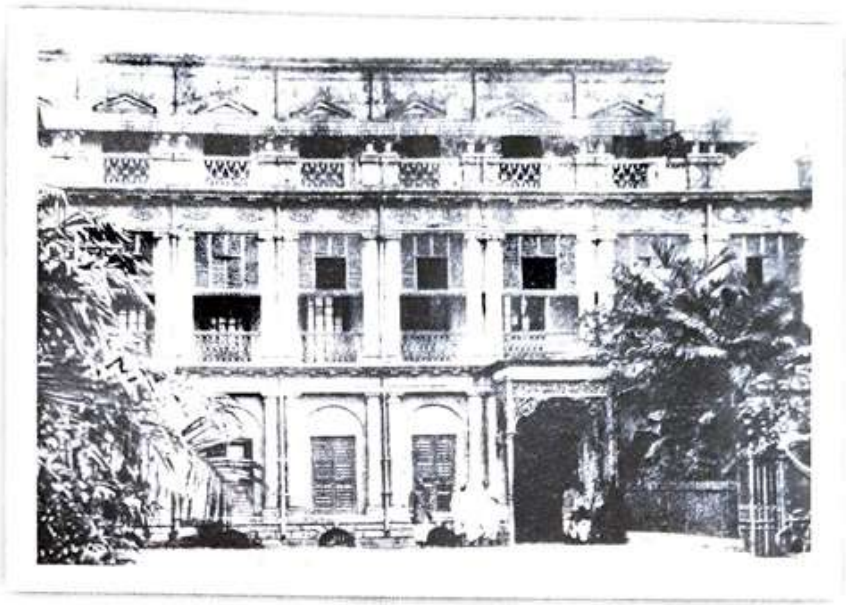

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি

যে-সংসারে প্রথম চোখ মেলেছিলুম সে ছিল অতি নিভৃত। শহরের বাইরে শহরতলীর মতো, চারিদিকে প্রতিবেশীর ঘর-বাড়িতে কলরবে আকাশটাকে আঁট করে বাঁধে নি। আমাদের পরিবার আমার জন্মের পূর্বেই সমাজের নোঙর তুলে দূরে বাঁধা-ঘাটের বাইরে এসে ভিড়েছিল।

আচার অনুশাসন ক্রিয়াকর্ম সেখানে সমস্তই বিরল। এই নিরালায় এই পরিবারে যে স্বাতন্ত্র্য জেগে উঠেছিল সে স্বাভাবিক,— মহাদেশ থেকে দূরবিচ্ছিন্ন দ্বীপের গাছপালা জীবজন্তুরই স্বাতন্ত্র্যের মতো।